ইসলামি সভ্যতা

(বাংলা-bengali-البنغالية)

চৌধুরী আবুল কালাম আজাদ

1431هـ - 2010م

islamhouse.com

﴿ الحضارة الإسلامية ﴾

(باللغة البنغالية)

أبو الكلام أزاد أنوار الله

2010 - 1431

islamhouse.com

ইসলামি সভ্যতা

ইসলাম জীবনর্শনের সার্বজনীন মূলনীতির উপরে ইসলামী তমদ্দুন প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের মূল্যবোধ এই তমদ্দুনের প্রাণ। সাহিত্য, শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের সহস্র প্রেরণা রয়েছে এই সংস্কৃতির মধ্যে। ইসলামী জীবনর্শনকে আল-কুরআনে বিশালাকার বৃক্ষের সংগে তুলনা করা হয়ছে। ধর্মের বাণী একটা বৃক্ষের মত, যার শিকড় থাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত আর শাখা প্রশাখা আসমানে মাথা উঁচু করে থাকে। (সূরা ইবারাহীম : ১৪,২৪) তৌহীদ (আল্লাহর একত্ব), মালিকিয়াত (আল্লাহর সার্বভৌমত্ব) ও খিলাফত (মানুষের প্রতিনিধিত্ব) এই তমদ্দুনের অপরিহার্য অংশ। আল্লাহ এক ও তিনিই একমাত্র উপাস্য ও তাঁর উপরে আর কেউ নেই, কোন শক্তি নেই।

তিনি শুধু মুসলিমের প্রভু নন, সমগ্র নিখিল বিশ্বেরই তিনি প্রভু। জাতি হিসেব কেবলমাত্র মুসলমানেরাই তাঁর অনুগ্রহ-প্রাপ্ত নন। সব জাতি এবং ব্যক্তিই তাঁর অনুগ্রহ ও রহমত পেয়ে থাকেন। তবে কোন জাতি বা ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর ঈমান, আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ, সততা, সাধুতা ও মানবকল্যাণের উপরই নির্ভর করে। প্রত্যেকটি মানুষ আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি এ সেই হিসেবে সমান অধিকারের দাবীদার। সব মানুষ পরস্পর ভাই-ভাই ও একই আইনের অধীন। এ বিষয়ে শাসক বা শাসিতের মধ্যে কোন তফাত নেই। আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে কোন মধ্যস্থতার বালাই নেই। এই জীবনদর্শনের বস্তু আত্মার কোন বিরোধ ও স্বীকৃত হয়নি; উভয় দিকেই দেয়া হয়েছে সমান মনোযোগ। মানুষে মানুষে সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত হবে ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে। ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে জ্ঞান, কার্যক্ষমতা ও নৈতিক উৎকর্ষের উপর ও জাতির শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে সুষ্ঠু ও সুবিচারমূলক সমাজ গঠনে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রথাই ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করে, রিবা বা সুদ এবং সর্ব প্রকারের অর্থনৈতিক শোষণ ঘোর পাপ ও মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি হিসেবে গণ্য হয়। সামাজিক কল্যাণের (অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি) সীমার মধ্যে থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ করা চলে। সুষ্ঠু সমাজ গঠনের জন্য ইসলাম বাধ্যতামূলক সামাজিক নিরাপত্তা বা যাকাতের বিধান দিয়েছে। ইসলাম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে যেতে জানিয়েছে উদাত্ত আহব্বান। ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা, অধিকার ও নিরাপত্তা ইসলাম স্বীকার করে। এই অধিকার কারো ছিনিয়ে নেবার অধিকার নেই।

সালাতের নীতি দ্বারা ইসলাম প্রচার করেছে যে, দুনিয়ার সব জাতির ভেতরই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন ও হযরত মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর শেষ রাসূল। এই নীতির দ্বারা মানব জাতির ঐক্য ও বুদ্ধিমত্তার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। ইসলামের মতে সত্য ও জ্ঞানের উপলব্ধিতে কোন জাতির একচ্ছত্র অধিকার নেই। মানব সংস্কৃতির ঐক্য পরস্পর নির্ভরশীল ও মানব মহিমার স্বীকৃতি রয়েছে। সংস্কৃতি সম্পর্কে এখানে উদার দৃষ্টিকোণ ও মানসিকতা, তার ভেতরে দেখি মানবতার জয়জয়কার। যদিও এই সাংস্কৃতিক বিচার বৃদ্ধি ও মূল্যায়ন মুসলিম সমাজের সামাজিক দুর্গতি, অর্থনৈতিক অরাজকতা গোষ্ঠীগত অন্ধকার মাঝে আটকে গেছে, তবু মুসলমানগণ দু:খের নির্মম তৌহীদে ও রিসালাতের আশ্রয় নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে পারেন, শত বাধা-বিপত্তি জয় করতে পারেন। তৌহীদ ও রিসালতের নীতিকে বুঝতে পারলে মুসলিম মানুষের নিছক নেতিবাচক ভাবধারা ও অন্তর্মুখিতা দূর হয়ে যাবে ও ইসলামী জীবনদর্শনের মূল উদ্দেশ্য সুষ্ঠু সমাজ সংগঠনের দিকে আমরা দৃষ্টি ফেলতে পারব। এ উপমহাদেশের মুসলিম বিজয়ের ইতাহাস থেকে জানতে পারা যায় যে, বিজয়ীরা সবাই এক জাতির লোক নয়- কিন্তু তারা একই সূত্রে গ্রথিত; তারা সবাই মুসলিম, এই ছিল তাদের পরিচয়। তুর্কী, আফগান ও

মুগল নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও ইসলামী জীবনদর্শন ও সংস্কৃতির এক একটা বিশিষ্ট অংশরূপে নিজেদের মনে করতেন। তৌহীদ ও সাম্যনীতি এই সব জাতিকে কম-বেশী ইসলামী সংস্কৃতির আওতায় এনেছিল। ইসলামী সংস্কৃতির একথা দাবী করে না যে, কেবলমাত্র এর মধ্যেই মানুষের মানুসিক ও সামাজিক জীবনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। দুনিয়ার সব ভাষা ও সংস্কৃতিকে ইসলামী তমদ্দুনে সম্মানের চক্ষে দেখা হয়।

বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাবধারার সার্থক অনুপ্রবেশ ইসলামের কাম্যও। এইজন্যই ইসলামে মৌলিক নীতি অক্ষুন্ন রেখে সামাজিক চাহিদা ও পরিবেশমাফিক নীতিকে (প্রিন্সিপালস্) বাস্তবে রূপায়িত করতে বলা হয়েছে। এর নাম ইজতিহাদ। ইসলামী জীবনদর্শনকে আধুনিক যুগে রূপায়ণের উপযোগী করে তুলতে হলেও আধুনিক মানুষকে ইসলামের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হলে যেমন একদিকে জ্ঞানের মারফত ইসলামের সামাজিক রূপায়ন প্রয়োজন,তেমনি শিক্ষা ব্যবস্থাও আমাদের মূল্যবোধ-অনুগ করে ঢেলে সাজাতে হবে। অধ্যাপক ইলিয়ট স্মিথ বলেন যে, ভাগ্যগুণে খৃষ্টজন্মের চার হাজার বৎসর পূর্বে মিসরে মানব সভ্যতার পত্তন হয় ও সেখানে থেকে তা তাইগ্রীস নদের তীরে, বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে, চীনে ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। একে বলা হয় সংস্কৃতি বিবর্তনের প্রত্যয় (ইভল্যুশনিষ্ট থিয়োরী) অপরদিকে অধ্যাপক টয়েনবি বলেন, অন্যান্য সংস্কৃতির সংগে সংযোগের ফলেই কোন একটা সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধিত হয়। একে বলা হয় সংস্কৃতির সঞ্চারশীল প্রত্যয় (ডিফিউশনিস্ট থিয়োরী)। রিসালাতের মারফত ইসলাম গৌণভাবে এই সঞ্চারী প্রত্যয়কেই সমর্থন করেছে।

আধুনিক দুনিয়ার সমগ্র মুসলিম জাতির একজন শাসক বা খলীফা ঘোষণা করলে বা সাধারণ মুসলিমের রোমান্টিক ঐক্যের (যার আংশিক প্রয়োজন কোন দিন ফুরিয়ে যাবে না) কথা প্রচার করলে কোন ফায়দা হবে না। দেশে-দেশে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের সমাজনীতির দ্বিধানীন রূপায়ণের মারফত ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অতঃপর মুসলিমের সামাজিক (সমাজ ব্যবস্থাগত) ও আধ্যাত্মিক এই উভয় মিলনের সেতু রচনা করা সহজ হয়ে যাবে। ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা ভিন্ন তথাকথিত রাজতন্ত্রগত মুসলিম রাষ্ট্রের সংগে খিলাফতভিত্তিক গণতন্ত্রী অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের সমঝোতা ও সত্যিকার মিলন অনেক দিক দিয়েই অসম্ভব ব্যাপার।

ইসলামী সংস্কৃতির মূল্যবোধ থেকে আমরা এই সত্যেরই ইঙ্গিত পাই। এখানে ঘটেছে বস্তু ও আত্মা, সমাজব্যবস্থা ও ব্যক্তিসত্তার সমন্বয়। দুনিয়ার সব কাজেই মুসলিমের ইবাদত, যদি তার ভেতরে জীবন সম্পর্কে সর্বাংগীন দৃষ্টিভঙ্গী ও মানবকল্যাণ নিহিত থাকে। দুনিয়ার কাজ করা দুনিয়াদার হওয়া নয়-আল্লাহকে ভুলে থাকার নামই দুনিয়াদার হওয়া। সমগ্র প্রকৃতিতে রয়েছে সত্যের নিদর্শন। সেই শক্তিকে উপলব্ধি করতে হবে, আহরণ করতে হবে। কারণ এই বাস্তব জগতই পরকালের শস্য ক্ষেত্র। আকল বুদ্ধি, মুহব্বত (প্রেম) ও মারেফাতের (সাধনা) মাধ্যমে ফালাহ (সাফল্য) লাভ করাই ব্যাপক অর্থে ইবাদত ও ইসলামী তমদ্দুনের বাস্তব পন্থা।

এমার্সনের মতে সংস্কৃতির যে বিশেষ গুণ সামাজিক সংযোগ ও আত্মগত নির্জনবাসের মধ্যে এক মাঝামাঝি পথ, তা ইসলামী সংস্কৃতিতে পুরোপুরি মেলে। সমগ্র জীবন নিয়ে ইসলামী সংস্কৃতির কারবার। স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক ছাড়াও মানুষের সমাজ জীবন, খাদ্য আহরণ ও অর্জনের পন্থা, যৌন-জীবন, রাষ্ট্রনীতি, শিল্প বাণিজ্য সম্পর্ক এবং এক মানবোচিত পরিকল্পনা এতে রয়েছে। অন্যান্য দার্শনিক আর্দশের (গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র) চাইতে মৌলিক বিষয়ে মতবিরোধ ইসলামের নেই বললেই চলে (পাশ্চত্য দেশগুলোর রাজনৈতিক গণতন্ত্র, সোভিয়েট রাশিয়ার অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ও কমিউনিস্ট চীনের স্বৈরবাদী

গণতন্ত্র)। ইসলামে শিয়া-সুন্নী মতবিরোধ রাজনৈতিক বিবর্তন সম্পর্কে মতবিরোধ। ইসলামী জীবনদর্শনের কোন মৌলিক বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে এই দুটো দল গড়ে ওঠেনি। আর এই জীবনদর্শনের মৌলিক নীতি ও সমাজদর্শনের কোন অস্পষ্টতা নেই। সুদূর প্রসারী এক একটি দিককে আদি সত্তার প্রকাশের সমগ্র রূপ বলে মুসলমান মনে করেন না, তাই তাকে পূজা না করে করেন অনুশীলন। ইসলামী সংস্কৃতির এই সর্বমুখিনতার ফলে আরবদের মধ্যে ইসলামের প্রেরণায় শিল্পকলা ও বিজ্ঞানচর্চার পরিপূর্ণতা ও স্মরণ একই যুগে সম্ভব হয়েছিল। কুরআন একখানা বিজ্ঞানের কিতাব নয়, বিজ্ঞানে সত্য প্রচার করা ও কুরআনের কাজ নয়। ইসলাম দিয়েছে বিজ্ঞানের প্রেরণা। সেই প্রেরণা সার্থক হয়েছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভবে। মানুষের মত আদিসত্তা আল্লাহ কোন ব্যক্তি নন, তিনি সেই মহান শক্তি, যিনি একই সঙ্গে একদিকে সুদূরপ্রসারী (ট্রানসেনডেন্টাল) অপর দিকে অনুপ্রসারী (ইমানেন্ট)। তাই তাঁর থেকে ইসলামী জীবনদর্শনের দার্শনিক ভিত্তি ও সর্বাংগীন (নিছক বস্তুগত নয়) বৈজ্ঞানিক পদ্ধিতর জন্ম হয়।

সমাপ্ত